ISSN : 2278 - 1994

Ahana
Peer-reviewed Bilingual Yearly on Visual Art and Culture
Volume - VII | 2021
e-mail : editorahana@gmail.com
Web : www.ahanajournal.in

বাংলার কাঠের-তৈরী লোকায়ত খেলনা-পুতুলের উৎস সন্ধানে

ড. সঞ্জয় সেনগুপ্ত

সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

চিত্র ১। চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া পুরুষ-মূর্তি

চিত্র ২। চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া নারী-মূর্তি

সারাংশ : *অবিভক্ত বাংলা, অর্থাৎ এখনকার পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের দৈনন্দিন শিল্পচর্চায় পুতুল তৈরীর ইতিহাস খুবই প্রাচীন —যার উপাদান হিসেবে সবচেয়ে পুরণো মাটি আর কাঠ। এখানকার লোকায়ত সমাজে প্রধানত দু'ধরণের কাঠের-পুতুল দেখা যায়— নাচের-পুতুল আর খেলনা-পুতুল— যদিও বিষয়বস্তুর নিরিখে আমাদের আগ্রহ দ্বিতীয় শিল্পধারা নিয়ে। সহজলভ্য নরম কাঠ থেকে খোদিত এই খেলনা-পুতুলগুলোর দেহ প্রথমে সাদা-রঙের প্রলেপ দিয়ে, তার উপরে দরকারমত হলদে-লাল-নীল-সবুজ-কালো ইত্যাদি রঙ ভরে— বলিষ্ঠ রেখার টানে চোখ, নাক, কাপড়ের ভাঁজের আভাস ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলেন শিল্পী-কারিগররা। এই পুতুলের অনেক নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় ঢাকা, কলকাতা, বাগনান আর বিষ্ণুপুরের সংগ্রহশালায়। এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে জসীমউদ্দিন আর গুরুসদয় দত্তের সংগ্রহের কথাও জানা যায়। গুরুসদয় দত্ত যে-সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলো গত শতকের প্রথমার্ধে বা কিছুদিন আগে তৈরী। কিন্তু আঠারো-উনিশ শতকের আগে তৈরী নিদর্শন দুই বাংলার কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা, মাধ্যম হিসেবে কাঠের ক্ষণভঙ্গুরতা, পোকামাকড়ের উপদ্রব আর এদেশের উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে— এই পুতুলগুলোর পক্ষে খুব বেশীদিন টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। অথচ, এরই পাশাপাশি, উন্নতমানের কাঠে তৈরী, নিয়মিত পরিচর্যায় থাকা, অথবা সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধানে এদেশের প্রাচীন দারুমূর্তির বেশ কিছু নিদর্শন আজও টিঁকে রয়েছে। যদিও তাদের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গত দেড়-দুশো বছরে তৈরী খেলনা-পুতুলের নিদর্শনগুলোর বিশেষ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আর তাই আপাতভাবে মনে হয় যে বাংলার কাঠের-পুতুলের ইতিহাস হয়তো নেহাৎই অর্বাচীন। অথবা হয়তো গত এক-দেড় হাজার বছরের মধ্যে এই শিল্পধারার মধ্যে এমন কোনও বিশেষ রকমের বিবর্তন ঘটে গেছে, যা ধরা পড়েনি আমাদের চোখে। সেই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের সূত্র খুঁজতেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।*

মূল শব্দমালা : *বাংলা, কাঠ, পুতুল, উৎস, ইতিহাস*

ভূমিকা:

সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার মতই ভারত-ভূখণ্ডের দৈনন্দিন শিল্পচর্চায় ছোট-মাপের মূর্তি বা পুতুল তৈরীর ইতিহাস খুবই প্রাচীন। সেই হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত হাজার-হাজার বছর ধ'রে এদেশের আদিবাসীরা মানুষ-পশু-পাখি -দেবদেবী ইত্যাদির পুতুল তৈরী ক'রে চলেছেন— নানা প্রয়োজনে, নানা আঙ্গিকে। সেই পুতুল কখনও তৈরী হয়েছে জাদু-বিশ্বাসের হাত ধ'রে, কখনও ব্রত-লোকাচারের অনুষঙ্গ হিসেবে, কখনও বা পুজোর উপাচার হিসেবে, কখনও আরাধ্য-মূর্তি হিসেবে, আবার কখনওবা

নেহাৎই খেলার সঙ্গী হিসেবে। স্থানীয়-মানুষের প্রয়োজন, আশেপাশে বাজার-হাটের চাহিদা, নানা জায়গায় মেলা-খেলার উপলক্ষ্য, দেশী-বিদেশী বাজারের নানরকম দাবি, আর মধ্যসত্ত্বভোগীদের নানাবিধ প্ররোচনায় এই সমস্ত পুতুল তৈরী হয় একাধারে সাধারণ গৃহস্থ-মহিলার দৈনন্দিনতায়, গ্রামীণ-কারিগরের পরম্পরায়, শহুরে-শিল্পীর কর্মশালায়, আর বড়-পুঁজির কলকারখানায়। তবে মাধ্যম হিসেবে আজকের দিনে সেরামিক, প্লাস্টার, পাথর, রাবার, প্লাস্টিক, ফাইবার ইত্যাদির ব্যবহার খুব বেশী দেখা গেলেও, নানা লোকাচার-পুজো-উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষ্যে গোবর, চালগুঁড়ো, ফুল ইত্যাদির ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। এমনকি খাবার হিসেবে ক্ষীর, সন্দেশ বা অধুনা কেক-পেস্ট্রি ইত্যাদি দিয়েও পশু-পাখি-মাছ-পরী এসবের ছোট ছোট পুতুল তৈরী করা হয় ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে।

তবে এই সমস্ত ক্ষণভঙ্গুর মাধ্যমগুলোকে বাদ দিলে, ভারতবর্ষ তথা বাংলায় পুতুল তৈরীর সবচেয়ে পুরণো উপাদন যে মাটি, সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সহজলভ্য উপাদান হিসেবে এদেশে মাটির জনপ্রিয়তা যুগে যুগে প্রমাণিত, যার অসংখ্য উদাহরণ আজও খুঁজে পাওয়া যায় শহরে-গ্রামে, দোকানে বাজারে, মেলা-খেলায়। আর প্রাচীনতার দিক দিয়ে, এইসব রোদে-শোকানো বা আগুনে-পোড়ানো মাটির পুতুলের পরেই সম্ভবত কাঠের-পুতুলের স্থান। তবে দুঃখের বিষয়— মাধ্যম হিসেবে এর ক্ষণভঙ্গুরতা, পোকামাকড়ের উপদ্রব আর সেইসঙ্গে এদেশের উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে— কদম-আমড়া-জিওল-শ্যাওড়া-ছাতিম-শিমূল ইত্যাদি সহজলভ্য কাঠ দিয়ে তৈরী পুতুলগুলোর পক্ষে খুব বেশীদিন টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। ফলে এদেশের এই আটপৌরে শিল্পধারার রূপরেখাটা আমাদের কাছে কখনওই খুব পরিষ্কারভাবে ধরা দেয় না।

বাংলায় কাঠের-তৈরী খেলনা-পুতুল :

অবিভক্ত বাংলা তথা এখনকার পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের লোকায়ত সমাজে প্রধানত দু'ধরণের কাঠের-পুতুল দেখতে পাওয়া যায় — নাচের-পুতুল আর খেলনা-পুতুল। প্রথমটা নির্দিষ্টভাবে পুতুলনাচের জন্য তৈরী হয় ব'লে তার আকার-আকৃতি, গড়ন-পেটন, রকম-সকম সমস্তটাই আলাদা — যার সঙ্গে দ্বিতীয়-রকম পুতুলের পার্থক্য বিস্তর। আর তাই এই প্রবন্ধে সেগুলো আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। এর পাশাপাশি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে উনিশ-শতকের শুরুয়াত থেকে যে কলে-তৈরী মোলায়েম নক্সাদার 'সুন্দর' পুতুলের চাহিদা-আর-যোগান মূলত শহরাঞ্চলের উচ্চবিত্ত সমাজে বহুল প্রচলিত, সেগুলোও আমাদের বিবেচনার মধ্যে পড়ে না। কেননা বিষয়বস্তুর নিরিখে আমাদের আগ্রহ মূলত-গ্রামীণ খেলনা-পুতুলের প্রাচীন, বিচিত্র আর সমৃদ্ধ শিল্পধারাকে নিয়ে — যা কিনা বাংলার লোকজ ঐতিহ্যের এক বিরাট অংশ দখল করে আছে অনেককাল ধরে।

সাধারণত সহজলভ্য নরম কাঠ থেকে প্রয়োজনমত চার থেকে দশ ইঞ্চি মাপের টুকরো কেটে নিয়ে, খোদাই করে তিনকোনা বা অর্ধগোলাকার মূর্তির আদল আনেন সূত্রধর শিল্পীরা। ক্ষেত্রবিশেষে হাত বা পা আলাদা করে তৈরী করে আঠা বা পেরেকের সাহায্যে জুড়ে দেন তাঁরা মূল শরীরের সঙ্গে। আদলের ওই বিশিষ্টতার জন্যে এই তিনকোনা বা অর্ধগোলাকার পুতুলগুলোকে অনেক সময় মমিপুতুলও বলে, যার পাশাপাশি একটু ভিন্ন-গড়নের পেঁচা, চাকাওলা ঘোড়া, হাতি ইত্যাদি পুতুলও দেশে বিদেশে সমান জনপ্রিয়।

যাই হোক, এই সবধরণের পুতুলের ক্ষেত্রেই খোদিত মূর্তির দেহ প্রথমে সাদা-রঙের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে, তার উপরে দরকারমত হলদে-লাল-নীল-সবুজ ইত্যাদি রঙ ভরে দেন শিল্পীরা। তার উপরে সাধারণত কালো বা অন্য উপযুক্ত রঙ দিয়ে বলিষ্ঠ রেখার টানে চোখ, নাক, কাপড়ের ভাঁজের আভাস ইত্যাদি ফুটিয়ে তুলে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন তাঁরা পুতুলগুলোকে। অতীতে এই কাজে দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরী রঙ ব্যবহার ক'রলেও, বর্তমানে বাজার-চলতি রঙের ব্যবহারেই শিল্পী-কারিগররা বেশী স্বচ্ছন্দ। তবে একটা কথা ঠিক, সাধারণভাবে পুতুলগুলোর সহজ সরল নির্মাণপদ্ধতি, গঠনকৌশল আর রঙের ব্যবহার অনেকাংশে একইরকম হওয়া সত্ত্বেও, বিভিন্ন অঞ্চলের সূত্রধরদের তৈরী নিদর্শনের মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

বাংলায় কাঠের-তৈরী খেলনা-পুতুলের পুরণো নিদর্শন:

অবিভক্ত বাংলা আর পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশে, কাঠের-তৈরী লোকায়ত খেলনা-পুতুলের অনেকগুলো পুরণো নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায় ঢাকার বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে, সোনারগাঁ লোকশিল্প যাদুঘরে, কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশালায়, আশুতোষ মিউজিয়াম অফ্ ইন্ডিয়ান আর্টে, বাগনানের আনন্দনিকেতন কীর্তিশালায় আর বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে। এছাড়া ব্যক্তিগত-উদ্যোগের মধ্যে পল্লীকবি জসীমউদ্দিনের সংগ্রহ করা কিছু নিদর্শনের কথা

আমরা জানতে পারি, যেগুলো তিনি কেঁদুলিতে জয়দেবের মেলা থেকে কিনেছিলেন। তবে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত নিদর্শনের তালিকায় গুরুসদয় দত্তের সংগ্রহই সবচেয়ে প্রাচীন ব'লে মনে হয়।

গত শতকের প্রথমার্ধে গুরুসদয় দত্ত কাঠের-পুতুলের যে-সমস্ত নমুনা দুই বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলো মোটামুটিভাবে তার সমসাময়িক বা কিছুদিন আগে তৈরী ব'লেই ধ'রে নেওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে, লোকশিল্পের চরিত্রধর্ম অনুসরণ ক'রে, এই পরম্পরার কালানুক্রমকে অবশ্যই ঠেলে দেওয়া যায় আরও অন্তত প্রায় এক-দেড়শো বছর। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে অবিভক্ত-বাংলার কাঠের-তৈরী খেলনা-পুতুলের ইতিহাসটাকে আঠারো-উনিশ শতকের বেশী কিছুতেই পিছনো যাচ্ছে না— যার প্রধানতম কারণ পুরণো নিদর্শনের অভাব। অর্থাৎ আঠারো-উনিশ শতকের আগে তৈরী কাঠের-তৈরী খেলনা-পুতুল দুই বাংলার কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

অথচ, এরই পাশাপাশি, উন্নত-মানের কাঠে তৈরী হওয়া, নিয়মিত অঙ্গরাগ ইত্যাদি পরিচর্যায় থাকা, অথবা অধুনা-সংগ্রহশালার বিশেষজ্ঞ — তত্ত্বাবধানে এদেশের প্রাচীন দারুমূর্তির বেশ কিছু নিদর্শন আজও টিকে রয়েছে এই পৃথিবীর বুকে। যদিও তাদের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গত দেড়-দুশো বছরে তৈরী খেলনা-পুতুলের নিদর্শনগুলোর বিশেষ কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আচার্য নন্দলাল মমি-পুতুলের গঠনশৈলীর সঙ্গে পাল-যুগের বিষ্ণুমূর্তির পিছন-চালির আকৃতিগত মিলের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিলেন বটে — কিন্তু মহারাষ্ট্রের কানহেরি থেকে পাওয়া তারা-মূর্তি (Sankalia 84; সেনগুপ্ত, পালযুগের ৩১৩-২৫; Sen Gupta, Wooden Idols 79) বা ঢাকার সোনারং থেকে পাওয়া স্তম্ভশীর্ষ (Bhattashali 228; Dasgupta 53-4:বানু ৯৭),অথবা রামপাল আর কাজিকসবা থেকে পাওয়া স্তম্ভগুলোর (Bhattashali 273-4; Dasgupta 54,66,74,144; সাঁতরা ১৫৮-৯ ; বানু ১০০-২ চিত্র ২১৭) আঙ্গিক, শৈলী আর নান্দনিকতার সঙ্গে উনিশ-কুড়ি শতকের পুতুলগুলোকে কোনওভাবেই মেলানো যায় না। এই দুই যুগের কাঠের-কাজগুলোর মধ্যে রূপভাবনা, গঠনশৈলী, আলঙ্কারিকতা আর কারিগরীর তফাৎ এতোটাই বেশী যে আমাদের দেখা-শোনা অনাড়ম্বর পুতুলগুলোর পূর্বসুরি হিসেবে, পাল-সেন যুগের এই সাড়ম্বর নিদর্শনগুলোকে কল্পনা করা খুবই কষ্টকর। আর তাই আপাতভাবে মনে হয় যে বাংলায় কাঠের-পুতুলের ইতিহাস হয়তো নেহাৎই অর্বাচীন। অথবা হয়তো গত এক-দেড় হাজার বছরের মধ্যে কোনও এক সময়ে এই শিল্পধারার মধ্যে এমন কোনও বিশেষ রকমের বিবর্তন ঘটে গেছে, যা অনবধানতাবশত ধরা পড়েনি আমাদের চোখে।

বাংলার শিল্প-ইতিহাসে কাঠের-তৈরী খেলনা-পুতুলের উৎস — কয়েকটা জরুরী প্রশ্ন:

একটা কথা ঠিক যে পাল-সেন যুগের দারুমূর্তিগুলোর সূক্ষ্ম কারুকাজ যেখানে মূল ভারত-ভূখণ্ডের ধ্রুপদী-শৈলীর অনুসারী, সেখানে আমাদের আলোচ্য উনিশ-কুড়ি শতকের খেলনা-পুতুলগুলো ভীষণভাবেই বাংলার লোকায়ত-সংস্কৃতির প্রতিনিধি। তাই এদেশের শিল্প-ইতিহাসে কাঠের-তৈরী খেলনা-পুতুলের উৎসবিন্দু হিসেবে নবম-দশম শতকের কাঠের-কাজের ধারা বা তার কোনও উপধারাকে ধ'রে নেওয়া যায় কিনা, সেটা অবশ্যই একটা বড় প্রশ্ন। আর যদি তা-ই হয়, তবে কি আমরা ধ'রে নেব যে বাংলার কাঠের-তৈরী খেলনা-পুতুলের যে পরম্পরা আজ লোকায়ত-শিল্পচর্চার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তার মূল সূত্র লুকিয়ে আছে প্রাচীনকালের পুঁজি-সমর্থিত উচ্চবর্গীয় শিল্পচর্চার মধ্যে? একই মাধ্যমে তৈরী মূর্তি-বিগ্রহের ক্ষেত্রে এই প্রবণতার স্বপক্ষে প্রচুর ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় এ কথা ঠিক (Sen Gupta, Stylistic Evolution 379-94), কিন্তু তা ব'লে কাঠের-পুতুলের ক্ষেত্রেও কি সেই একই জিনিস ঘটেছিল? গুটিকয় ব্যতিক্রম বাদ দিলে— এগুলো কি তবে উচ্চবিত্তের ঘর-সাজাবার জিনিস বা ছেলেমেয়েদের খেলার-জিনিস হিসেবেই আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল? পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কি ক্রমশ তা লোকজীবনের অঙ্গ হ'য়ে উঠেছে? সেই জন্যই কি এই পুতুলগুলো আজ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নেহাৎ আলঙ্কারিক হ'য়ে র'য়ে গেছে— উপলক্ষ্যকেন্দ্রিক-লোকাচার বা ধর্মীয় অনুষঙ্গের সঙ্গে যাদের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই? তবে তা বঙ্গীয় শিল্পধারার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন শুধু ঐতিহাসিক নয়, তাত্ত্বিকও বটে! আর তা-ই যদি হয়, তবে কি আমরা ধ'রে নেব যে সেই শুরুর দিন থেকে শুরু ক'রে বাংলার কাঠের-কাজের সামগ্রিক পরম্পরার গতিপ্রকৃতি একই দিকে প্রবাহিত হ'য়েছিল? উচ্চবর্গীয় থেকে নিম্নবর্গীয়, ধ্রুপদী থেকে লোকায়ত — রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক আর ধর্মীয় বিবর্তনের সুদীর্ঘ ধারা কি এ'ভাবেই বাংলার শিল্প-ইতিহাসের গতিপথকে চালিত করেছিল? আর যদি তা ক'রেই থাকে, তা হ'লে তার প্রকৃত স্বরূপটা কী? সেই ক্রমবিবর্তনের ধারপথটাইবা ঠিক কী রকম? প্রশ্নগুলো থেকেই যায়।

বাংলায় কাঠের-কাজের প্রাচীনতা :

ঐতিহাসিক বিচারে বাংলার কাঠের-কাজের প্রচলিত ধারা সম্পর্কে প্রাচীনতম আভাস আমরা পাই খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে,

মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে।[১] কলিঙ্গযুদ্ধের পরে, গোটা উপমহাদেশ জুড়ে চুরাশি হাজার স্তূপ তৈরীর যে মহাপ্রকল্প ধম্মাশোক নিয়েছিলেন, তার বেশীরভাগই তৈরী হ'য়েছিল কাঠ, বাঁশ আর খড়ের সাহায্যে। (Havell, Indian Architecture 47) আর এই স্থাপত্যযজ্ঞে সমাদরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল তৎকালীন বঙ্গদেশের কুশলী সব বাস্তুকারদের, কাঠ-বাঁশ-খড়ের কাজে যাঁদের দক্ষতা ছিলো প্রশ্নাতীত আর বহুলপ্রচারিত। তাঁদের নিজেদের হাতে এবং তত্ত্বাবধানে তৈরী সেইসব অস্থায়ী স্থাপত্যের নিদর্শন আজ আর নেই। তবে বাংলার কাঠের-কাজ আর চালাঘরের গঠন-শৈলী তাঁদেরই হাত ধ'রে চিরস্থায়ী জায়গা ক'রে নিয়েছে ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডে তৈরী নানা গুহাস্থাপত্যে। মহারাষ্ট্রের লোমশ ঋষি আর সুদামা গুহা, মধ্যপ্রদেশের সাঁচী আর ভারহুত, অন্ধ্রপ্রদেশের অমরাবতী ইত্যাদির প্রবেশপথ আর গর্ভগৃহের তক্ষণশৈলী আজও দাঁড়িয়ে আছে সেই সাক্ষ্য বহন ক'রে। (সেনগুপ্ত, প্রাচীন ভারতে ৯২-৪)। এর পাশাপাশি অবশ্য বাংলার কাঠের-কাজের তিনটে ছোট-মাপের অথচ তাৎপর্যময় নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়, যেগুলো রাখা আছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালায়।[২] উত্তর পব্বিশ পরগণা জেলার চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া এই মূর্তিগুলো ঐ প্রাচীন প্রত্নস্থানের দ্বিতীয়-যুগের ব'লে মনে করা হয়। সেই হিসেবে, এগুলো নিঃসন্দেহে এখনও পর্যন্ত পাওয়া প্রাচীনতম কাঠের-কাজ, অবিভক্ত বাংলার শিল্প-ইতিহাসে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া নিদর্শন :

চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া তিনটে ছোট-মূর্তির মধ্যে প্রধানত যে দুটো নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করবো, সে-দুটোই হ'ল মানুষের অবয়ব— তার মধ্যে একটা পুরুষ, আরেকটা নারীমূর্তি (চিত্র ১ ও ২)।[৩] এছাড়া সাধারণ একটা মাছের মূর্তিও আছে, তা এই প্রবন্ধের ক্ষেত্রে খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়।

যাই হোক, এখানে মানুষের অবয়ব দুটোর নৃতাত্ত্বিক-চরিত্র, রূপকল্পনা আর কারুকাজের বৈশিষ্ট্য দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে সেগুলো শুঙ্গ-যুগের সমসাময়িক। কেননা তাদের মুখের আদল, শরীরের ভঙ্গি, পোষাক-আষাক, অলঙ্কারের ধরণ আর নক্‌শা ইত্যাদি সমস্ত কিছুর সঙ্গেই রয়েছে শুঙ্গ ভাস্কর্যের এক আশ্চর্য মিল। অন্যদিকে নারীমূর্তির চুলের বাঁধন, কানের দুল, গলার হার, হাতের চুড়ি-গাছ আর কোমরের-বিছে দেখে মনে প'ড়ে যায় ঐ একই জায়গা থেকে পাওয়া টেরাকোটা-ফলক বা ভারহুত-স্তূপের সীমানা-প্রাচীরের গায়ে খোদাই করা নারীমূর্তির কথা। অর্থাৎ রূপভাবনা, রীতি আর শৈলীর বিচারে এ'কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে এই টেরাকোটা, কাঠ আর পাথরের মূর্তিগুলো একই যুগে তৈরী— খৃঃ পূঃ দ্বিতীয়-প্রথম শতকে। সেই সময়ে সম্ভবত একজন শিল্পী এই তিনটে মাধ্যমেই কাজ ক'রতেন বা ক'রতে পারতেন — যার ফলস্বরূপ একই সময়ে তৈরী নানা-মাধ্যমের শিল্পবস্তুর মধ্যে এ'রকম অদ্ভুত মিল। বহুমুখী-দক্ষতার এই চর্চা - লোকায়ত আর উচ্চবর্গীয় ধারা নির্বিশেষে — ভারত-ভূখণ্ডের শিল্পী-কারিগরদের এক সুপ্রাচীন পরম্পরা, যার হদিশ পাওয়া যায় দুই বাংলার সূত্রধরদের মধ্যেও। (Ray 321-328)

পরম্পরার এই সূত্র ধ'রেই ভারহুত-ভাস্কর্যের তুলনামূলক অগভীর আর অনমনীয় খোদাই কাজের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় পাথর কাটার কাজে কাঠ-খোদাই শিল্পীদের প্রথম হাতে-খড়ির জলজ্যান্ত নমুনা। (Havell, Indian Eculpture 90-91) অর্থাৎ শুঙ্গ-যুগের আগে থেকেই — মৌর্য-যুগ বা তারও আগে —ভারত-ভূখণ্ডের শিল্পী-কারিগররা কাঠের-কাজে হাত মক্‌শো ক'রে নিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, যার পিছনে অবশ্যই ছিল সংগঠিত পুঁজি বা সম্পদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কেননা শিল্প ইতিহাসের সেই ঊষাকালে, বৃহত্তর-ভারতভূমির লোকায়ত সমাজ অনেক বেশী অভ্যস্ত, স্বচ্ছন্দ আর সাবলীল ছিল মাটি বা অন্যান্য মন্ডের সাহায্যে মূর্তি-নির্মাণের কাজে — কাঠ বা পাথরের মত খরচসাপেক্ষ মাধ্যমে নয়। আর তাই এ'কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে সব ধরণের কাঠের মূর্তি — ছোট হোক বা বড় —তৈরী হ'তে শুরু ক'রেছিল প্রাচীন-সমাজের বিত্ত ও ক্ষমতা দ্বারা সমর্থিত উচ্চকোটির ধ্রুপদী-শিল্পের মধ্যে দিয়ে। সেক্ষেত্রে এই একই মাধ্যমে খেলনা-পুতুল তৈরীর ইতিবৃত্তটাও যে অনেকটা একই রকম হবে, সে'কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সেই কারণেই হয়তো অন্যান্য-মাধ্যমে তৈরী লোকায়ত-পুতুলের নানবিধ আচার-অনুষঙ্গ আজও এদের মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত।

তবে প্রাপ্ত নিদর্শনের বিচারে, মৌর্য-যুগে বাংলার বুকে 'কাঠের-তৈরী খেলার-পুতুল' ব'লে আলাদা ক'রে কিছু তৈরী হ'ত কিনা, হ'লেও তার চেহারা কীরকম ছিল, সে-বিষয়ে নির্দিষ্ট ক'রে কিছু বলা যায় না। কেননা ঐ ধরণের ছোট-মূর্তির সাক্ষাৎ প্রথম আমরা পাই আরও পরে, শুঙ্গ-যুগে এসে — চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া আমাদের আলোচ্য নিদর্শন দুটোর মধ্যে দিয়ে। ভারহুত-ভাস্কর্যের সমসাময়িক এই মূর্তিগুলো কেন যে তৈরী হয়েছিল, কোন কাজেই বা এই ধরণের মূর্তি ব্যবহার হ'ত, সেগুলো সম্পর্কে সঠিক কিছু

চিত্র ৩ । বোড়ো গ্রামের সঙ্কর্ষণ-বলরাম।
আনুমানিক খৃঃ চোদ্দ-পনেরো শতকে তৈরী।

চিত্র ৪ । কালীঘাট থেকে সংগ্রহ করা নতুনগ্রামের বউ-পুতুল।
২০ শতকের প্রথমার্ধে তৈরী, এখন গুরুসদয় মিউজিয়ামে।

জানা যায় না। তবে পুরুষমূর্তির পায়ের নীচে বেদীর আভাষ দেখে অনুমান করা যায় যে সেটা এক সময় কোথাও একটা রাখা হ'ত। পাশাপাশি নারীমূর্তির ভাঙ্গা-পায়ের নীচেও যে একইরকম কিছু একটা ছিল, সেটা বুঝে নিতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। অর্থাৎ এই দুটো মূর্তি নিশ্চয়ই স্বাধীনভাবে তৈরী হয়েছিল — সম্ভবত কোনও বিত্তবান/ক্ষমতাবানের গৃহসজ্জার অঙ্গ হিসেবে — অন্য কোনও বড়-কাজের অনুষঙ্গ হিসেবে নয়। এদের আকার-আকৃতি আর গঠনগত বৈশিষ্ট্য দেখে ম'নে হয় সেই সময়ে বাংলার বুকে 'কাঠের-তৈরী খেলার-পুতুল' বলতে হয়তো এ'রকমই দেখতে ছিল—যদিও রূপ, রীতি, শৈলী বা নন্দনতত্ত্বের বিচারে, এদের মধ্যে কোন মিল নেই।

বাংলার কাঠের-তৈরী লোকায়ত খেলনা-পুতুলের উৎস সন্ধানে :

একটা কথা পরিষ্কারভাবেই বলা যায় যে— দৃশ্যগত রূপ আর নান্দনিকতার বিচারে, শুঙ্গ-যুগের মূর্তিদুটোর সূক্ষ্ম কারুকাজ উনিশ-কুড়ি শতকের লোকায়ত খেলনা-পুতুলের সহজ-সরল অভিব্যক্তি থেকে অনেকখানি আলাদা। কেননা আগের নিদর্শনগুলো স্পষ্টতই মূল ভারত-ভূখণ্ডের ধ্রুপদী-শৈলীর অনুসারী, যার বিবর্তিত আর বিবর্ধিত রূপ আমরা দেখতে পাই পাল-সেন যুগের ঐশ্বর্যময় দারুভাস্কর্যে। সেই তুলনায় পরবর্তীকালের খেলনা-পুতুলগুলো নিশ্চিতভাবেই বাংলার লোকায়ত-সংস্কৃতির প্রতিনিধি। যার সঙ্গে সেই সময়কার কাঠের-তৈরী মূর্তিবিগ্রহের মিল অনেক বেশী।

দুই বাংলার দারুবিগ্রহের ইতিহাসে ষোল-সতেরো শতক বা তার পরবর্তীকালে তৈরী নিদর্শনগুলোর পূর্বপুরুষ হিসেবে নবম-দশম শতকের মূর্তিগুলোর দাবি আজ নানাভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর সেই সমস্ত কাজের শিল্পী-কারিগর হিসেবে সূত্রধরদের হাতের কাজের পরিসর, বৈচিত্র্য আর পারদর্শীতার কথাও আজ সর্বজনস্বীকৃত— যার অন্যতম অভিব্যক্তি হিসেবে আমরা দেখতে পাই কাঠের-তৈরী খেলনা-পুতুলগুলোকে। (Ray 321) তাই একই কারিগর গোষ্ঠীর হাতে একই মাধ্যমে তৈরী মূর্তি-বিগ্রহ আর খেলনা-পুতুলের দুই ধারা খুব ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হয়েছিল ব'লে মনে হয় না। অর্থাৎ ঠিক প্রথমটার মত, দ্বিতীয় ধারাটাও আজ লোকায়ত-শিল্পচর্চার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ব'লে স্বীকৃত হ'লেও, তার মূল উৎসবিন্দু প্রাচীনকালের সেই পুঁজি-সমর্থিত উচ্চবর্গীয় শিল্প-চর্চার মধ্যেই লুকিয়ে আছে হ'লে মনে হয়। আর তাই আঠারো-উনিশ শতকের খেলনা-পুতুলগুলোর আদিপুরুষ হিসেবে চন্দ্রকেতুগড়ের নিদর্শনদুটোকে ধ'রে নিতে বিশেষ কোনও আপত্তি হওয়ার কথা নয়।

এই সূত্র ধ'রে এগোলে, এ'কথা বুঝে নিতে আমাদের আর কোনও অসুবিধে থকে না যে কেন এই পুতুলগুলোর বেশীরভাগ

শুধুই আলঙ্কারিক হ'য়ে র'য়ে গেছে — উপলক্ষ্যকেন্দ্রিক-লোকাচার বা ধর্মীয়-অনুষঙ্গের সঙ্গে যাদের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। কেননা, সেই শুরুর দিন থেকে এগুলো নেহাৎই উচ্চবিত্তের ঘর সাজাবার জিনিস বা ছেলেমেয়েদের খেলার-জিনিস হিসেবেই আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল। পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গশিল্পের সামগ্রিক গতিপ্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে — পরিবর্তিত চাহিদায়, লোকশিল্পীর হস্তক্ষেপে তা ক্রমশ উচ্চবিত্তের সমাজে ব্রাত্য আর লোকায়ত জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হ'য়ে উঠেছে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু ক'রে খৃষ্টীয় আঠেরো শতক— এই দু'হাজার বছরে বাংলার কাঠের-কাজের সামগ্রিক পরম্পরার গতিপ্রকৃতি অনেকটা একই দিকে প্রবাহিত হ'য়েছিল। উচ্চবর্গীয় থেকে নিম্নবর্গীয়, ধ্রুপদী থেকে লোকায়ত— এই বিশেষ নান্দনিক যাত্রাপথের কারণেই শুঙ্গ-যুগের কাঠের-পুতুলের সঙ্গে ঊনিশ-কুড়ি শতকের লোকায়ত খেলনা-পুতুলের রূপে এতোখানি পার্থক্য। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক আর ধর্মীয় বিবর্তনের সুদীর্ঘ ধারা এ'ভাবেই বাংলার শিল্প ইতিহাসের গতিপথকে চালিত ক'রেছিল। তবে তার প্রকৃত স্বরূপ আর ক্রমবিবর্তনের ধারাপথ সম্পর্কে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা করা যায় না। আর তাই এখনও পর্যন্ত দুই-বাংলার কাঠের-তৈরী লোকায়ত খেলনা-পুতুলের উৎসমুখটাকে চিহ্নিত করার কাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু কতগুলো সম্ভাবনা আর অনুমানের উপর।

উপসংহার—ঐতিহাসিক বিবর্তনের সম্ভাব্য রূপরেখা :

সব মিলিয়ে একটা জিনিস অন্তত বোঝা যাচ্ছে যে, সেই প্রাচীনতম কাল থেকে শুরু ক'রে খৃষ্টীয় বারো শতক পর্যন্ত, অবিভক্ত বাংলার কাঠের-তৈরী খেলনা-পুতুল সম্ভবত সমগ্র ভারত-ভূখণ্ডের একীভূত ধ্রুপদী-শৈলীকেই পুষ্ট ক'রেছে এবং তার দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে গ'ড়ে ওঠা পুঁজি-সমর্থিত উচ্চাঙ্গ-শিল্পচর্চার এই রূপ প্রথম আমাদের সামনে আসে শুঙ্গদের রাজত্বকালে— চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া নিদর্শন দু'টো যার অন্যতম উদাহরণ। পরবর্তীকালে তেরো-শতকের গোড়ায়, তুর্কী বিজয়ের ফলে, সারা বাংলা জুড়ে যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরী হয়, তার ফলে উচ্চবর্গীয় শিল্পী-কারিগরদের বেশীরভাগই চলে যান প্রতিবেশী হিন্দু রাজাদের দরবারে। আর যাঁরা যাননি বা যেতে পারেননি, তাঁর হয় নতুন পুঁজির ইচ্ছেপূরণে নিয়োজিত হন, আর না-হ'লে জীবিকা বদল ক'রতে বাধ্য হন। এহেন পরিস্থিতিতে, তাঁদের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য ডাক পড়ে লোকায়ত সমাজের শিল্পী-কারিগরদের, কাঠের-কাজে যাদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল খুবই সীমিত। তাই তাঁদেরকে দিয়ে উচ্চবর্গীয়-দর্শন আর রীতি-নীতি অনুযায়ী মূর্তি-বিগ্রহ তৈরীর কাজ করিয়ে নেওয়া প্রাথমিকভাবে খুব একটা সহজ ছিল না। কিন্তু এই সুযোগে দু'টো আপাত-সমান্তরাল ধারার মধ্যে এক-ধরনের দার্শনিক-ও-কারিগরি সমন্বয়-সাধন আর নান্দনিক-বোঝাপড়ার চেষ্টা শুরু হয় দু-পক্ষ থেকেই — যা চলতে থাকে পরবর্তী প্রায় তিনশো-বছর ধ'রে। নতুন পরিস্থিতিতে লোকায়ত-শিল্পীরা চেষ্টা ক'রলেন নতুন ধরনের চাহিদার উপযুক্ত ক'রে নিজেদের গড়ে তুলতে, আর তাঁদের সহজাত প্রতিভার সাথে নিজেদের দর্শন আর কল্পনাকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা ক'রলেন উচ্চবর্গীয় মূর্তিতাত্ত্বিকরা। এই অপূর্ব ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন ক'রে আজও দাঁড়িয়ে আছে বর্ধমান জেলার বোড়ো-গ্রামে সঙ্কর্ষণ-বলরামের এগারো-ফুট উঁচু মূর্তি (চিত্র ৩)—যার মধ্যে দেখা যায় ধ্রুপদী ভাবধারা আর লোকায়ত শৈলীর এক সফলতম সংশ্লেষ। (Sen Gupta, Balaram 77-85)

সেই সময়ে এই বঙ্গদেশে কাঠের-তৈরী খেলনা-পুতুলের প্রবহমান ধারাটা ঠিক কী অবস্থায় ছিল, তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলাদা ক'রে কিছু জানা যায় না। তবে বাংলার কাঠের কাজের সামগ্রিক প্রেক্ষিতে বিচার করলে বোঝা যায় যে তিন-শতকের এই সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এখানকার লৌকিক শিল্পী-কারিগরদের হাত ধ'রে একটা তৃতীয় শিল্প-রূপের জন্ম হয়েছিল, যা একান্তভাবেই বাংলার নিজস্ব। (সেনগুপ্ত, বাংলার ধর্মীয় ৯০-১) আজ বাংলার শিল্প, বাংলার মূর্তি, বাংলার পুতুল বলতে আমরা সাধারণত যে সহজ সরল, ঈষৎ-বর্তুল, অনাড়ম্বর আদলটাকে বুঝি, তার জন্ম হয়েছিল এইভাবে— ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে। অবশ্যই এর পিছনে অনুঘটকের কাজ করেছিল নিতাই-গৌরের নেতৃত্বে গ'ড়ে ওঠা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আন্দোলন আর কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের হাত ধ'রে শাক্ত-ভাবনার পুনরুজ্জীবন।

বঙ্গীয় শিল্পধারার এই নবতর মূলস্রোতে গ্রামীণ লোকায়ত শিল্পী-কারিগরদের ভূমিকা হ'য়ে উঠলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর অপরিহার্য। মাটি, কাঠ, পাথর, পট ইত্যাদি সমস্ত রকমের মাধ্যমে তাঁরা ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন বঙ্গ-সংস্কৃতির এক একীভূত রূপ — তার ভাবনা, দর্শন, কারিগরি আর নান্দনিকতা-সহ। পরবর্তী দুই-দশকে এই অনন্য শিল্পরূপেরই নিরলস-চর্চা আর বিচিত্র প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। সম্ভবত সেই একই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে, এই ক্রমবিবর্তনের অনিবার্য অঙ্গ হিসেবে,

'চন্দ্রকেতুগড়ের কাঠের-পুতুল'-এর উচ্চবর্গীয়, ধ্রুপদী আর মৌলিক শিল্পধারা ক্রমশ 'লোকায়তিক' হয়ে ওঠে— যার আপাত-প্রাচীন নমুনাগুলো আমরা দেখতে পাই গুরুসদয় মিউজিয়ামে।

টীকা:

[১] আনুমানিক ২৭৪ - ২৩৭ খৃষ্টপূর্বাব্দ।

[২] AX/SC/98

[৩] প্রথমটার মাপ ৬ ১/৪″ X ১ ১/৪″ X ১ ১/৪″ আর দ্বিতীয়টার মাপ ৬″ X ১″ X ১/ ২″

তথ্যসূত্র:

বানু, জিনাত, মাহরুখ। বাংলাদেশের দারুশিল্প, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা, ২০০৩

সাঁতরা, তারাপদ, বাংলার কাঠের-কাজ, সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিজ্ অ্যান্ড্ ট্রেইনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, কলকাতা, ২০০৩

সেনগুপ্ত, সঞ্জয়। পাল-যুগের দারুবিগ্রহে বৌদ্ধ দেবদেবী। এবং আমরা, ৮/১, পৃঃ ৩১৩-২৫

প্রাচীন ভারতে কাঠের কাজ : শিল্প-ইতিহাসের এক হারিয়ে যাওয়া অধ্যায়। দশদিশি, শিল্পকলা সিরিজ (প্রথম ভাগ), ভারতশিল্প, ২৯ ও ৩০তম একত্রিত সংখ্যা, ২০১৭, পৃঃ ৮৬-১০৫

বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্যে টেরাকোটা অলঙ্করণ : লোকায়ত বিস্তারে এককের বিনির্মাণ। দশদিশি, শিল্পকলা সিরিজ (দ্বিতীয় ভাগ), লোকশিল্প পরিক্রমা, ৩১ ও ৩২তম একত্রিত সংখ্যা, ২০১৮, পৃঃ ৭৯-১০৮

Bhattashali, Nalini Kanta, *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum.* Bangladesh National Museum, Dhaka, 1929/2008

Dasgupta, Kalyan Kumar, *Wood Carvings of Eastern India*. Firma KLM Pvt Ltd, Kolkata, 1990

Havell, E B, *Indian Sculpture and Painting,* London, 1928

Indian Architecture Through The Ages, New Delhi: Asian Publication Services, 1978

Census Tribes and Castes of West Bengal. pp. 321-328, 1951.

Mookerjee, Ajit, Folk Toys of India, Oxford Book & Stationary Co, 1956

Ray, Sudhansu Kumar, The Artisan Castes of West Bengal and Their Craft, *Mitra, Ashok (ed), Census 1951, West Bengal: Land and Land Revenue Department – The Tribes and Castes of West Bengal.* West Bengal Govt. Press, pp. 321-8, 1953

Sankalia, H. D., A Unique Wooden Image of the Buddhist Goddess Tara from the Kanheri Caves, *Marg,* Vol. 36 (No. 1), p. 84, December 1982

Sen Gupta, Sanjay, *Wooden Idols of West Bengal: an aesthetic approach*, Kolkata, Ph.D Thesis (University of Calcutta), May 16 2012

Wooden Idols of India: the antiquity of a traditional excellence, *Chitrolekha International Magazine on Art and Design,* Vol. 6 (No. 1), 76-81, 2016 (DOI: http://www.chitrolekha.com/V6/n1/07_Wooden_Idols_India.pdf)

Balarama of Boro: a Unique Specimen of Bengal Sculpture, *Chitrolekha International Magazine on Art and Design,* Vol. 6 (No. 2), 77-85, 2016 (DOI: http://dx.doi.org/10.21659/chitro.v6n2.08)

Stylistic Evolution of Wooden Idols: changing faces of history in Bengal Art, *The Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities,* Vol. 9 (No. 2), 379-94, 2017 (DOI: https://dx.doi.org/10.21659/rupkatha.v9n2.37)

চিত্রসূত্র : (চিত্র ৩) গুরুসদয় সংগ্রহশালার ওয়েবসাইট (http://www.gurusadaymuseum.org/col_dol_wood.html)